প্রথম প্রকাশ
ডিসেম্বর, ১৯৬০

প্রকাশক
রাসবিহারী দত্ত
ক্রান্তিক প্রকাশনী
বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩

মুদ্রক
সুব্রত পাঠক
দি স্পেকট্রাম
২এ শিবগোপাল ব্যানার্জি লেন, হাওড়া।

কবি শ্যামসুন্দর দে

শ্রদ্ধাস্পদেষু

অন্যান্য গ্রন্থ :

সাঁকো (গল্পগ্রন্থ—২য় সংস্করণ)

চৌমাথায় চারজন (উপন্যাস — যন্ত্রস্থ)

সময় শহর ও মানুষের গল্প (গল্পগ্রন্থ—প্রকাশ আসন্ন)

ভাবনা ইতস্ততঃ (সমালোচনা গ্রন্থ—যন্ত্রস্থ)

একটা বিশেষ বয়সে অনেকের নাকি কবিতা লেখার 'অসুখ করে'। ব্যাধিটা বড়ো সংক্রামক। হবেই তো। বাংলার জল-হাওয়া-মাটিতে এ রোগের ভাইরাস দ্রুত সংক্রমণ ঘটায় যে।

ছোটবেলা থেকেই এ রোগে একটু-আধটু ভুগছি। সময় এবং অন্য আরো সীমাবদ্ধতা তথাকথিত এ রোগের উপশম ঘটিয়েছে, সন্দেহ নেই। কিন্তু নিরাময়ের বুঝি আশা নেই। নইলে এই গ্রন্থ প্রকাশের ঝুঁকি নেবার দুর্বুদ্ধি এমন করে চেপে বসবে কেন!

ছাঁটাই-বাছাই বড়ো শক্ত কাজ, বিশেষ করে আমার মতো একটু-আধটু যাঁরা লেখেন। ঠগ বাছতে বাছতে গাঁ উজাড় হবার জো আর কি! তাই ওই ঝক্কিতে যাইনি। রচনাকালগুলোর সাক্ষ্য দিতে পারতো একখানা খাতা, সেটা নিরুদ্দেশ। পুরনো পত্র-পত্রিকা ঘেঁটে যা পাওয়া গেল, সেগুলোই এখানে রাখা হলো। অপ্রকাশিত যা ছিল, খাতাখানা উদ্ধার পেলে হয়তো একটু আলোর মুখ দেখতো, কিন্তু সে আশা আপাততঃ নেই। প্রকাশকাল অবশ্য উল্লেখ করা সম্ভব, কিন্তু রচনাকালকে

গরহাজির রেখে প্রকাশকালের লেবেল এঁটে দেওয়া নিছক বাহুল্য মনে হয়। স্মৃতির ওপর জবরদস্তি না করে যতদূর মনে পড়ে লেখাগুলোর রচনাকাল ১৯৬১ থেকে ১৯৮১ সালের মধ্যে। আমার কবিতায় সমসাময়িক আর্থ-সামাজিক ঘটনাবলীর প্রতিফলন ঘটেছে। কেননা কবি-সাহিত্যিকরা এই সমাজেরই লোক, মাটি ও মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তাঁরা বাতাসে ভর করে থাকেন না।

এই গ্রন্থ প্রকাশে অগ্রজপ্রতিম সুশান্ত পাঠক এবং প্রীতিভাজন রাসবিহারী দত্তের কাছে আমার ঋণ অপরিশোধ্য।

মধ্যরাতে শব্দহীন

একটা অন্তরঙ্গ গান শুনবো বলে
বন্ধ রেখে সদর দরজা
প্রত্যূষে উঠে একা একা
খিড়কি দিয়ে বেরিয়েছিলাম।

একটা অন্তরঙ্গ গান শুনবো বলে
ভরদুপুরে নিশ্চিন্তপুরে
ফসল-বোনা মাঠ পেরিয়ে
ইচ্ছামতী হয়েছিলাম।

একটা অন্তরঙ্গ গান শুনবো বলে
তরল সাঁঝে বুনো ঝোপে
পরিপূর্ণ নিজের ভেতর
সারা অঙ্গ ঢেকেছিলাম।

একটা অন্তরঙ্গ গান শুনবো বলে
কাঁপা কাঁপা করপুটে
দুহাত ছাপিয়ে বিষণ্ণতা
আঁজলা ভরে নিয়েছিলাম।

মধ্যরাতে শব্দহীন
ধ্রুপদী সংগীত শুনতে পেলাম ঃ

পেয়ালা চাই না সাকী
কণ্ঠনালী রক্তে ভাসে
ঝুলন্ত চাঁদের দিকে চেয়ে
গাইছে নব্য ওমর খৈয়াম।

গরমিল ঘাতকের হাতে

যখন দূরে থাকি হিসেবে গরমিল
তোমার কাছে গেলেও সব হিসেব ভুল হ'য়ে যায়

অথচ এভাবে ঠিক এইভাবে
যোগ বিয়োগের আঁক ক'ষে আমি
কোন দিন হিসেব মেলাতে চাইনি।

আমি জানি এভাবে হিসেব মেলে না।

বটের ঝুরিতে গিঁট দিয়ে কবেকার
বানানো দোলনায়
দুলে দুলে তিন সত্যি উচ্চারিত
কৈশোরের অঙ্গীকার
শয়তান সময় বর্শা হাতে ছুটে এসে
ছিন্নভিন্ন ক'রে গ্যাছে এফোঁড় ওফোঁড়!

এ ভাবে হিসেব মেলে না

সময় প্রহরী শুধু নয়
সময় ঘাতক
আর
গরমিল ঘাতকের হাতে।

কৃষ্ণচূড়ার খোঁজে

একটু নিরালা ভালো লাগতো বলেই হয়তো
অদূর দ্রাঘিমায় ছিলো স্বপ্নের আকাশ—
তখনো বুঝিনি সে পথ কতো দূর হতে পারে
কতো দুর্গম হতে পারে বারুদের গন্ধে সে বাতাস
বুঝিনি সান্ধ্য আইন অন্ধকারে মেতে
ভারী বুটের আঘাতে ও বুলেটে
কী ভাবে ভাঙতে পারে নির্বিচারে টক্‌টকে লাল
কুঁড়ি সমেত গুচ্ছ গুচ্ছ কৃষ্ণচূড়ার ডাল।

প্রতিদিন সূর্য ওঠে
প্রতিটি সকাল তবু ভাসে বিষণ্ণ বাতাসে
প্রতি রাত আসে যায়
হাজারো চিন্তায় কাড়ে ঘুম
কোথায় উধাও হয় সাধের পাণ্ডুলিপি কোন্ নিরালায়
কি জানি কোথায় থাকে সোনার পাথর বাটি—
কবিতা হারায় মানুষ, কবিতা হারায় মাটি।

তারপর একদিন
যখন নিরালা ছেড়ে বেরিয়ে এলাম
দেখলাম, সারি সারি রক্তপতাকাবাহী মুষ্টিবদ্ধ হাত
প্রখর রোদের আঁচে রক্তে ঘামে উদ্‌গত শিরায়—
প্রশ্ন করলাম ঃ ময়দানে নেমেছে ওরা কারা?
প্রতিজ্ঞা কঠিন দৃপ্তকণ্ঠে জবাব দিলো একজন,
'দুষমন ময়দানে নামে এ ধারণা অবশ্যই ভুল'
আবার পল্লবিত ডালে দেখলাম কৃষ্ণচূড়া ফুল।

সেতু

তার শরীরে পচন ধরেছিল অনেক দিন আগে
গতকাল মাঝরাতে চারটে তাড়িখোর জোয়ান মরদ
হেঁইও-হেঁইও পাল্কি—বেহারার মত কাঁধে তুলে
বলহরি—হরিবোল বলতে বলতে
পাড়াময় প্রদক্ষিণ সেরে খাড়া
দাঁড় করিয়ে রেখে গেছে তাড়িখানার
সামনের পাঁচিলটার গায়ে
ঠেস দিয়ে।

কবে ওদের মর্জি হবে, যদি হয়
আবার হয়তো শুইয়ে রাখবে যথাস্থানে।
জলে ভাসিয়েও দিতে পারে
দাহ করতে পারে চিতা সাজিয়ে।
মাটিতে গর্ত খুঁড়ে ইচ্ছে হলে
কবর দিতেও পারে—
মৃতদেহ সৎকারের ব্যবস্থা হিসেবে
যেটা খুশি।

মোদ্দা কথাটা হলো এই
ওটা নেই!

সাধ্যিও নেই যে পার হই এক লাফে
কোমরে বাত, বাঁকা শিরদাঁড়া।

আসল কথা বাস্তবতা

আসল কথা, ভুল ঠিকানায় চিঠি যায়না যে যা-ই বলুক
ভিন চাবিতেও তালা খোলে না।

মনে আছে কী কথা ছিলো ?
ভরদুপুরে রোদের আঁচে গন্‌গনে যে যাত্রা হবে
সামিল হবার কথা ছিলো সেই যাত্রায়   মনে আছে ?

বন্দী করবে ভেবেও ছিলে সুখের ঘরে অহংকারে
ইচ্ছেগুলোর স্বপ্নগুলোয় সব নিরাপদ সুখের ঘরে
ঈপ্সিত সেই সুখের ঘর আজকে বলো কোথায় গেল
জ্বলছে কেন এই হা-হুতাশ ? জমাট গ্লানির
মরচে-পড়া মস্ত তালা ঝুলছে কেন ?

স্থির নিশানাই ঠিক ঠিকানা   যে যা-ই বলুক
নকল কোন ভুল-ঠিকানায়—আসল কথা, চিঠি যায় না।
বদ্ধ আগল ভাঙতে হবে   যে যা—ই বলুক
ভিন চাবিতে তালা খোলে না—এটাই কথা, বাস্তবতা।

নিষ্ঠুরতা দাও

প্রত্যাশার পারাবত-পথে এ নিঃসঙ্গ গান
আমার ভালো লাগে না।

অনেক প্রসন্ন প্রত্যয় নিয়ে
সময়ের ডানায় ভর করে আমি সেই
রহস্যাবৃত প্রত্যাশায় পৌঁছে যাবো ভেবেছিলাম।

প্রতীক্ষায় শুধু দিন কেটে গ্যাছে।

মা, তোমার দুর্বিনীত সন্তানদের ভেতর
আমাকে একটু ঠাঁই করে দাও
জ্বলন্ত মধ্যাহ্নে খেলা ছেড়ে আমি
দগ্ধীভূত মেহনত দিতে চাই—
বিশ্বস্ত জীবনের পথে দুর্নিবার চৈতন্যের ঝড়ে
স্নান করে নিতে চাই সজ্জিত নক্ষত্রমণ্ডলে।

তুমি শুধু সাময়িক নিষ্ঠুরতা দাও।

তারপর এক দিন
কৃষ্ণচূড়ার ডালে ডালে আমরা আনবো বসন্ত
রোদ ছড়ানো নিকোনো উঠোনে
তুমি দেবে আলপনা   নিরুপমা কাব্যের শরীর।
তখন তোমার দুর্বিনীত সন্তানেরা
তোমার নরম নিবিড় চোখে
আমরা প্রত্যেকে কবিতা।

এখন এই পাতা-ঝরা মুহ্যমান দিনে সাময়িক
আমাকে কঠিন দুর্বার হ'তে দাও।

ভালবাসার ছেঁড়া চিঠি এবং হিসেবের খাতা

সে কোন্ ভালবাসার চিকন সবুজ চিঠি
বিপ্রলালিত স্থান বর্ণিমায়
রূপসী নীলখামে প্রাপকের কাছে একে একে
সবুজ সবুজ ভাঁজে জমা হয়ে যায় !

তারপর একদিন হিসেবের হলুদ খাতা
ভরে যায় আদিখ্যেতার লেজারে জার্নালে
সে কোন্ ভালবাসার চিকন হরিৎ পাতা
ফিকে হয় হতে থাকে হলুদ হলুদ ডালে।

সে কোন্ অভিমানের নীল নীল চিঠি কপট শাসন
কোন্ ভালবাসার সবুজ প্রত্যয়
শব্দপায়ী পরাদৃষ্টি চিত্রিত ভাষণ
স্বাক্ষরবিহীন হিসেবের খাতা হয়ে যায় !

সে কোন্ ভালবাসার ছেঁড়া চিঠি হিসেবের খাতা
লাভ-ক্ষতি জমা-খরচ যোগ-বিয়োগের আঁকে
সবুজ সবুজ মনের রামধনু পাতা
সময়ের ছোপ লেগে ক্রমশঃ নীল নীল হলুদ হতে থাকে।

ট্রেন

প্রতিদিন ট্রেন ধরি সকাল রাত্তির
ভিড়ের ভেতর ধাক্কাধাক্কি
অসতর্কে মাড়িয়ে দিই ব্যস্ততায়
বেওয়ারিশ শিশু কিংবা বৃদ্ধের শরীর।

প্রতিদিন ঠেলাঠেলি অসংখ্য যাত্রীর
সব্জি বোঝাই বস্তা-মাথায় ত্রস্ত ব্যাপারীর গুঁতো
কোনমতে সামলে নিই বিচক্ষণ
খেলোয়াড়ী কায়দায়।

লাউড স্পীকারে কান পাতি—
কোন্ ট্রেনে রেক্ নেই
কোন্ ট্রেন সাইডিং হবে
কোন্ ট্রেন ঘোষিত বাতিল!

ইস্টিশানে হা পিত্যেশ তারপর
প্লাটফর্মে বে-আব্রু দেখি গেরস্থালি।

হঠাৎ সুরেলা কণ্ঠ উধাও সাইরেন ধ্বনি
মগজে জমাট ঢেলা সংকেত সবুজ
দুধারে লাইন পাতা পাঁজরা বরাবর
ট্রেন চলে ক্ষিপ্রগতি বুকের ভেতর।

বিশ্বাসে সূর্যের বীজ

থমথমে কালো রাত
একটা নিশাচর পাখি ডেকে গেল—
অন্ধকারের বুক চিরে কর্কশ আর্তনাদের
একটা তীর যেন ছোটাছুটি করছে
এদিক থেকে ওদিকে।
দেওয়ালে দুলছে কালো ছায়া
অন্ধকার নিশিপটে চলচ্চিত্র যেন।

নিরন্ধ্র তমসার আড়ালে নিশীথগন্ধার
সৌরভ নেই ঘ্রাণে আর
এই ছায়াস্তম্ভিত রুদ্ধ ঘর ঃ এই পীড়ন কক্ষ
থেকে কবে মুক্তি পাবো জানি না।

শুধু জানি অতল সুপ্তির আচ্ছন্নতাই
শেষ কথা নয়—
তারপর আশ্চর্য প্রত্যুষ ঃ নতুন সূর্যের বীজ
সুদৃঢ় বিশ্বাসে।

বিকল্প

হাঁটু ভেঙে মুখ গুঁজে
কি হবে ভেবে ভেবে ?
নিথর অন্ধকার ধীরে ধীরে
এই ভাবে
দেখবে আরো গাঢ় হবে

আর সেই জমাট অন্ধকারের গর্ভে
তোমাকেও মানতে হবে
বন্দীদশা।

পারো নাকি তার চেয়ে
জীবনের আশ্রয়ে
সোজা রাখতে মেরুদণ্ড
স্বোচ্চার ঘোষণায় ?

বুকের ভেতর ট্রাম

আমি মুখ ফেরালুম অন্যদিকে জানালায়
আকাশে টুকরো টুকরো মেঘের কিনারে
তখন বিকেলের রোদ সোনালি জরির মত
নিচে মরসুমি ফুলের বাগানটা
রঙে রঙে ইন্দ্রধনু ।

ভাঙা সেতুটাকে নতুন করার স্বপ্ন
আকাশে দুর্গ তৈরীর সাধ—
সে তো আমি জানি ।

আত্মপক্ষের সমর্থন কে না চায় !
সে তা চাইবে না জানি,
তবু বিবেকের
কঠোর অনুশাসন আর দ্বিধায়
নিজের কাছে পলাতক সে নিজেই ।

ফিরে চাইলুম পেছন দিকে যখন
কখন সে নিঃশব্দে চলে গেছে জানি না ।

ট্রামের একটানা ঘর্ ঘর্ শব্দের
ছন্দ আমি শুনতে পেলুম অকস্মাৎ
একটা যান্ত্রিক শব্দ শুধু বুকের ভেতর ।

মশাই সুজনেষু

"ফাটা ডিমে তা' দিয়ে" আর
দীক্ষা নিয়ে দাস্যতা
তফাৎ রাখা যায় কি মশাই
আত্মকেন্দ্রিক মনস্কতা ?

মাঝখানে নিয়ে ঠাঁই
আয়েসী মেজাজে উদাসীন
ঘরের নয় ঘাটেরও নয়
চলে কি মশাই বেশি দিন ?

বুদ্ধিজীবী হলেই কি চাই
তক্‌মা-আঁটা বিশিষ্টতা
পরিণাম তার নেই কি জানা—
"বল্‌ মা তারা দাঁড়াই কোথা ?"

পঁচিশে বৈশাখে

পৃথিবী বহতা
বহতা তোমারও জন্মোৎসবের মামুলি ঘটা

কিন্তু ক্লান্তি লাগে,
বার বার বড় ক্লান্তি লাগে
যখন দেখি তোমার মুখ
ফুলের মালা আবৃত্তি আর
সস্তা বক্তৃতায় গতানুগতিক
অনুষ্ঠানের প্রতিফলনে—
বৎসরান্তে একই আয়নার ফলকে
পঁচিশে বৈশাখে।

চাওনি তো নির্বিকল্প না-মঞ্জুর
অথবা নির্বিরোধ স্বীকৃতি
বিপরীতে সঞ্চারিত বিতর্ক
বরং চেয়েছো, তবু দেখ—
ঐতিহাসিক মূল্যবোধের প্রামাণিক
অস্তিত্ব কেমন মাথায় রেখেছি, শুধু
অন্তরে আনতে পারিনি।

নিখরচা এবং রাস্তা চেনা বিষয়ক পদ্য

বলি গো মশাই কোন দিকেতে যাবেন
কিংবা আদৌ যাবেন না তাই ভাবেন ?
কোন দিকেতে ফুসমন্তরে মুঠোর মধ্যে পাবেন
যা কিছু চান বর্তমানে কিংবা পরে চাবেন ?

মনে মনে নিখরচায় অনেকদূর তো গেলেন
ভেবেছেন কি একটিবারও আখেরে কি পেলেন ?

নিখরচায় পেতে চান মূল্য দিতে ভয়
বিনামূল্যের মাপে কিন্তু রাস্তা চেনা দায় ।

মানসাঙ্ক

এইভাবে নাকি অদৃষ্টের ফের অবশ্যই
অমোঘ নিয়মবশে কেটে যাবে—তারা ভাবে
নিজস্ব স্বভাবে।

তাই তারা
অনন্ত রহস্য ঘেরা সুচেতন বোধ
অলস স্নিগ্ধ রাখে প্রিয় অনুভবে,
স্বপ্ন দ্যাখে ঝিমোনো দুপুরে
প্রচণ্ড খরার দিনে নির্মেঘ আকাশে খোঁজে
ইন্দ্রধনু সাত রঙা।
বোবা চোখ মেলে দেয় দিগন্তে ধূসর
সারা দিন নভোচারী বিহঙ্গের নির্ভার ডানায়
নীল-নীল স্বপ্ন দ্যাখে একান্তে ঝিমোয়।
ভাবে বুঝি একদিন অলৌকিক প্রসন্ন সকাল
অকস্মাৎ ছিঁড়ে দেবে কুয়াশার পুরু আস্তরণ।

ভীরু আর্তনাদে সহ্য করে সব।

নির্বোধ জানে না নিশ্চিত নিশানা
মীমাংসা চূড়ান্ত কোন্ পথে।
প্রাইজ পাবার আশায় ফি-হপ্তা যেমন
লটারি টিকিট কাটে ভাগ্য-অভিলাষী
উত্তর মেলে না তবু হিজিবিজি
দিন রাত আঁক কষে, মুছে ফ্যালে, আঁক কষে
মুছে ফ্যালে বোধের শেলেটে।

ডাইরি থেকে

এই তো সেদিন,
চর হাসনাবাদ তখন সংবাদ।

সাংবাদিকের ঝর্ণা কলম থেকে
ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু উপছে পড়ছে
শেয়ালদা হাওড়া মানা মালকান
নিয়ে কাব্যিক চর্চা দৈনিক কাগজে।

আমিও একটা পদ্য লিখবো বলে
একদিন গেলাম হাসনাবাদ
দু' বোতল বীয়ার ঝর্ণা কলম আর
রঙিন চশমাও সঙ্গে ছিল।

ইছামতীর চরে ভেসে–ওঠা মস্ত
হাঁ–মুখ কুমিরটার চোখে
অফুরাণ জল দেখে আচমকা
দণ্ডক–ফেরা বুড়োটা খেঁকিয়ে উঠলো ঃ
বেহায়া বজ্জাত, মায়া কান্না কাঁদো
অ্যাদ্দিন কুথায় ছিলে দেড় কুড়ি বছর ?

দোটানায় দোলে না সেতু

দোটানায় দোলে না সেতু দ্বিধাটাই দোলে
সেতুর নিচেই জমাট অন্ধকার
নিথর নিশীথ আরো গাঢ় হলে
বিলম্বিত লয়ের একটানা সুর সারাক্ষণ
জেগে গান করে।

স্বেচ্ছাবন্দী যতই থাকো ভীরু আর্তনাদে
নিষ্করুণ দুঃখস্মৃতির হিম বন্দীদশা
শূন্য দৃষ্টির নিগূঢ় সঞ্চারে
ক্রমশ আঁধার জমে ক্রমশ আঁধারে,
উধাও ইন্দ্রধনুর বর্ণালী আভাস
বিশুদ্ধ স্বপ্নেরা ধূসর ভিন্ন দৃশ্যপটে।

যেহেতু অনন্ত ক্ষুধা জঠরে এখন
বুকের ভেতর জ্বলে দাউ দাউ চিতা
নিরিবিলি অন্তর্লীন নিটোল নির্জনতা
নরম পেলব স্বর্গ সোনার হরিণ
পাখির গান ভোরের আলো ভালবাসা ঘৃণা
একাকার স্বরচিত দেয়ালের শরীরে।

দোটানায় দোলে না সেতু দ্বিধাটাই দোলে।

তোমার কাছে ফীথন হয়ে যাই

(রবীন্দ্রনাথকে মনে রেখে)

যখনি ভেবেছি তোমার সপ্তাশ্বের সাতটি বল্গা
তুলে নেবো আমার হাতে
অলিম্পাসের উত্তুঙ্গ চূড়া থেকে ছেড়ে দেবো রথ
সারা অঙ্গে মেখে নেবো স্বর্গীয় ঔষধি
উদ্দাম আবেগে ছোটাবো উন্মাদ
পশ্চিমগামী অশ্বদের ঘোরাবো উত্তরে
বিদ্রোহের নতুন পথে দিগন্ত কেঁপে উঠবে
বিপুল হ্রেষার বিচিত্র কোরাসে
গঙ্গা সিন্ধু রাইন ভল্গার বদলে যাবে স্রোত
উত্তেজনায় উথলে উঠবে ইউফ্রেটিস্-টাইবারের বুক
ছুটে পালাবে কালপুরুষ ভয়াল কর্কট
জ্বলে উঠবে উত্তর আকাশের শীতল নক্ষত্র।

তখনি দেখেছি তোমার হাসিতে
আমার সর্বাঙ্গ হিম হয়ে যায়
অমোঘ বজ্র হাতে জুপিটার এসে
দাঁড়ায় সম্মুখে
পশ্চাতে ক্রন্দসী জননী ক্লাইমিনি—

আর তখনি সূর্যদেব, আমি
তোমার কাছে ফীথন হয়ে যাই।

এখন অমলেরা

তোমার অমলেরা
কি এখন জানলায়
দইঅলার খোঁজে
দাঁড়িয়ে থাকে ?

তোমার সুধারাও
এখন আর ফুল
নিয়ে আসে না
হয়তো খোঁপায়
গুঁজে রাখে।

তোমার অমলেরা কিন্তু
এখনো চিঠির আশায় থাকে
রাজার চিঠি অথবা প্রজার
যা হোক একটা কিছু।
দোরে দোরে ধর্ণা দেয়
কর্মখালির পাতা দ্যাখে রোজ
নো ভ্যাকান্সির তাড়া খায় তবু—
চিঠির আশায় থাকে।

ইচ্ছেগুলো নদী

আঁজলা ভ'রে বিষণ্ণতা ছুঁড়ে ফেলি যদি
সুখ নামে ইচ্ছেগুলো ঘোরে কাছে কাছে
যেমন ঘন অন্ধকারকে গিলে ফ্যালে নদী
সংখ্যাহীন তারার মালা বুকে নিয়ে নাচে।

বেবাক বাসনার চারা প্রত্যাশিত সুখ
প্রখর খরার তাপে দগ্ধ হয় যদি
স্বপ্নের নষ্টবীজ প্রেমিকার মুখ
স্মৃতির পলিতে উর্বরা, ইচ্ছেগুলো নদী।

তবু

দিনে দিনে বাসনার
মৃত্যু যদি হয়
প্রত্যাশার স্পন্দন যদি
না জাগে, রুদ্ধ
বাসনায় অন্তরীণ মনে—
চলমান মুহূর্তেরা
ছায়া ফ্যালে তবু।

নিত্যকার প্রত্যাশায় যদি
জমে শুধু সঞ্চিত লাঞ্ছনা
দিনে দিনে ফিকে হয়
সবুজ প্রত্যয়
নীলাকাশ ব্যঙ্গ করে যদি—
বিষণ্ণ আকাশ চিরে
দামাল হাওয়ায় তবু
সূর্য অভিযান।

স্পষ্টতঃ

এইখানে
যেমন আছি
একা একা
স্বপ্নাতুর

আলো আকাশ
প্রেম নির্জনতা
যদিও কাছে কাছে
স্পষ্টতঃ বহুদূর !

চেনা মুখ দেখে

চমকে উঠি অকস্মাৎ
চেনা মুখ দেখে

চেঁচিয়ে বলতে পারি না ঃ
এই দ্যাখো
দাঁড়িয়ে আছি এই যে সটান
এক সময় পৌঁছে যাবো ঠিকঠাক
যেমন সৌভাগ্যবান সুনিশ্চিত
পৌঁছে যায়
অনুবর্তনের অমোঘ নিয়মে।

আবার চুপিচুপি বলাও যায় না ঃ
এই দ্যাখো
সব বুজরুকির শ্বাস রোধ করে
সূর্যালোকে
শুকিয়ে নিয়েছি জীবনের
ভিজে বিষণ্ণতা।

রুদ্ধ দ্বার আধখোলা জানালায় বসে
চমকে উঠি অকস্মাৎ চেনা মুখ দেখে।

উভয়তঃ

পারবে কি পারবে না তো
ফিরিয়ে দিতে দিনগুলো সেই
জমা আছে ঝিনুকের ভেতর
যেমন থাকে মুক্তোর মতো !

পারবে কি পারবে না তো
ভুলে যেতে দিনগুলো যা
জড়িয়ে আছে শাড়ির ভাঁজে
মনের ভেতর চুমকির মতো !

পারবে কি পারবে না তো
হেসে হেসে ভাসিয়ে দিতে
নতুন মনের পরিণতি এবং যত
রূপান্তর উভয়তঃ ।

বস্তুতঃ মেঠো পথে
হাঁটেনি যে তখনো,
যায়নি নদীর চরে
ফসলের মাঠে।
কোন মিঠেল গলায়
অন্তরঙ্গ সুর
মানুষের—
শুনেছে কি কখনো ?

প্রদীপ্ত আলোকে চোখ রেখে

যদিও
বিংশ শতাব্দীর দোলায়িত দ্বিধা
তোমার চলার পথ করেছে পিচ্ছিল
অন্ধকার চারিদিক
অনুজ্জ্বল ভবিষ্যতের পাণ্ডুর ছায়ায় ভরা
হৃদয় দিগন্ত।

যদিও
ক্লান্তির ছায়া করেছে বিধুর
সকরুণ দৃষ্টিতে শুধু
মৌন যন্ত্রণার ম্লান ছবি
প্রতীক্ষিত স্বপ্নের বিগত প্রহর
অবসন্ন চেতনায়।

তবু
হোক জর্জরিত সর্বদেহ যন্ত্রণায়
মানুষের আরণ্য প্রবৃত্তির ছুরি
তোমাকে আঘাত করুক বারংবার
প্রত্যহের দ্বিধা ভুলে
প্রদীপ্ত আলোকে ঐ চোখ রেখে দেখ
অন্ধকার দীর্ঘতর নয়।

অবশ্যই সেদিন আসবে

একদিন অবশ্যই একদিন
প্রতিকূল ছায়াপাতে
সাঙ্গ হবে পুতুল খেলা
থেমে যাবে প্রেতের
উৎসব নৃত্য।

বহুরূপীর সাজপোষাক সেদিন
ভোলাবেনা চোখ
চুপিচুপি আসবেনা আততায়ী
হামাগুড়ি দিয়ে।

সেদিন স্বার্থান্বেষী
মাতবে না তাৎক্ষণিক
স্বার্থের নেশায়।
হত্যা করবে না নিজের হাতে
জীবনের শেষতম রশ্মিপথ
আলোর নিশানা।

সেদিন ভাঁজে ভাঁজে পুষ্ট হবে
নতুন মনের পরিণতি
দোটানায় দুলবে না কেউ।

সেদিন প্রত্যয়ে প্রোজ্জ্বল হবে
সংশয়ের নিবু নিবু দীপ।

অবশ্যই সেদিন আসবে।

কপোতাক্ষ দিন

তার কালো জলের আয়নায়
কত দিন দেখিনি যে মুখ !

অথচ ওই আয়নায় মুখ রেখে
খুনসুটি আর ভেংচি কেটে
সকাল দুপুর বিকেলে
পেয়েছি কত সুখ ।

সেই কপোতাক্ষ আজো কি আছে
আছে কি তার ছোট ছোট ঢেউ ?

জেলে ডিঙি মাছ ধরা
খেয়া নৌকো পার করা
মিঠে জল কচুরিপানা
আধেক–চেনা নাম–না–জানা
ঘোমটা-টানা কেউ ?

স্মৃতির কোঠায় কপোতাক্ষ
আছে অমলিন
হারিয়ে গেছে শুধু আমার
কপোতাক্ষ দিন ।

রবীন্দ্রনাথ ঃ শতবর্ষের আলোকে

সে এক আশ্চর্য দ্বীপ
সীমাতীত বিস্ময়ের খনি
মহাকাল অতন্দ্র প্রহরী।

সে এক আশ্চর্য পুরুষ
জ্যোতির্ময় বসতি
আমাদের মনে।

সে এক অপার পারাবার
কত যে নাবিক মন
কূল ছুঁয়ে ফেরে
তবু তার
রহস্য অফুরাণ।

উল্টোরথ কতদূর

রথ যাত্রায় কবির
ডাক পড়েছিল——
একঝোঁকা পিচ্ছিল
অসমান বেতালা পথ
পাড়ি দিতে হবে তফাৎ
রেখে অসুন্দরের হাত।

'যাদের নাম করতে নেই'
তাদের নিয়ে কবি
মহাকালের রশিতে
দিয়েছিল টান——
বলেছিল : উল্টোরথের
পালা এলে উঁচুতে নিচুতে
হবে বোঝাপড়া।

বলতে পারো রবীন্দ্র ঠাকুর
সেই উল্টোরথ আর কতদূর ?

ওনারা সাহিত্য (?) করেন

ওনারা সাহিত্য করেন
ভয় নেই বোধিদ্রুমের নিচে নিরাপদ
আশ্রয় স্বেচ্ছাবন্দী ঘরে যত খুশি
লিখে যান মরচে-পড়া মগজে
রাশি রাশি বই।

যাই লেখেন ছাই ভস্ম
সোনার পাথর বাটি অনর্গল
বুকনিসার নকল ফানুস
অনড় খোঁটায় বাঁধা পাঁকের ভেতর
নিছক নোংরা ঘেঁটে নোংরা ঘেঁটে
নিত্যি মাপেন থই।

এভাবে অন্তর্লীন নিজস্ব খাঁচায়
প্রাত্যহিক ঋণশোধ অধীনের কলমে
প্রতিপাদ্য যৌনাচার
মেয়ে মানুষের শরীর নিয়ে
খিস্তির হদ্দ।

লেখা–লেখা খেলা
মানে আদিখ্যেতা শব্দ
নিয়ে কসরৎ ট্রাপিজের খেল
বে-আদব বাহাদুরী মস্করায় মৌতাত
গন্তব্য কানাগলি যেন
তাড়িখোর মদ্দ।

মধ্যিখানে ধাঁধাঁ

বহুরূপীর সাজ-পোষাকে দেখাই কত রঙ
খেয়াল খুসীর আচরণে জানাই কত ঢঙ।
মিষ্টি মিষ্টি কথায় দেখ বুনেছি যত জাল
শক্ত কথায় আজও পারি মেটাতে তার ঝাল।

নিজের অসুখ যা-ই থাক অন্যের বেলায় বদ্যি
অসুখটা কি কেউ বোঝে না কোলা ব্যাঙের সর্দি।
বাক্যির বেলায় বেজায় দরদ উষ্ণ প্রস্রবণ
কম্মের বেলায় কালো হাতে দেখাই বৃন্দাবন।

ছোট্ট বেলায় পুতুল খেলায় দিতুম যেমন সাজা
আজও পাই এই বয়সে সেই বয়সের মজা।

খুকু যেমন তেমনি পুতুল খেলাটিও সাদা
আমি যেমন তুমিও তেমন মধ্যিখানে ধাঁধা।

আকাল যখন

আমরা তো জানি চটকদার
মোড়কটা খুললেই
বেরিয়ে পড়বে বেড়ালছানা।

শহর থেকে কষ্ট করে
হাজার মাইল এসেছেন
রোদচশমা সোনার কলম
মদের বোতল এনেছেন—
সময় নষ্ট না করে বরং
লিখে যান দেদার ভড়ং
লেকচার-টেকচার দেবেন না।

আকাল যখন পরোয়া কিসের
মাকাল ফলেই বাজার গরম
চলছে যেমন চলুক না।

কলকাতা

যতই তুই গয়না পরিস
দুই কানে তোর নিয়ন বাতির
অ্যাসফল্ট-ঢাকা মসৃণ বুকে
ছোটাস হাজার অ্যামবাসাডার
লেক ময়দান ইডেনে তোর
আউট্রাম ঘাটে গঙ্গার ধারে
যতই খুসির পুষ্পিতবোধ
বাজাক নিত্য ঝুমঝুমি
উড়াল পুল পাতাল রেলে
কিংবা হোটেল রেস্তরাঁ বারে
রেসের মাঠে সবুজ ঘাসে
খেলার মাঠে ফ্লাড লাইটে
যতই কেন সাজিস না তুই
মাথা তুলিস স্কাই-স্ক্র্যাপারে।

রূপের গরব করিস না আর
প্রিয়তমা কলকাতা তুই
সারা অঙ্গ চেয়ে দ্যাখ
ডাবের খোলা শালপাতা আর
থুতু পেচ্ছাপ ইত্যাদিতে
হাইড্র্যান্ট উপচে-পড়া রাবিশ
বেবাক চোখ চেয়ে দ্যাখ—
উদোম শিশু ডাস্টবিনে তোর
নোংরা ঘেঁটে উচ্ছিষ্ট খায়
মা গিয়েছে তার বেচতে দেহ
ঝুপড়ি ঘরে অন্ধকারে

ভাত জোটেনি ক'দিন যাবৎ
বাপ বেচারা জ্বরের ঘোরে
বেহুঁশ হয়ে শুয়ে আছে তোর
বুকের ওপর ফুটপাতে
চেয়ে দ্যাখ তুই গঙ্গার ধারে বন্দরে
মরা উটের অনড় গ্রীবা
সারি সারি জেটি জুড়ে
নিশ্চল ক্রেণ ঝিমোয় শুধু
যেমন ঝিমোয় বেকার যুবক
ছাঁটাই কর্মী কাজের শোকে
খা-খা গুদাম উদোম হাসে
তাকিয়ে থাকে জাহাজ ঘাটায়
বিচালি-বোঝাই গাদা বোটে।

নিলাজ হাসি হাসিস না তুই
গরবিনী কলকাতা রে।

ভানুমতী

তিনি চাইলে তারা কথা বলে
তাঁর ইঙ্গিতে তারা চুপ
তিনি সদয় হলে তারা নৃত্য করে
রঙ-বেরঙা মুখোস পরে
হাজারো সঙ নৃত্য করে।

তিনি চাইলেই আজব মেলা
তাঁরই ইসারায় ট্রাপিজের খেল।

তিনি প্রসন্না হলে
তারা পেখম মেলে
ময়ূর পুচ্ছধারী কাকেরা ভজন গায়
সব তাঁরই ইচ্ছা ভানুমতী তিনি
দুষ্ট জন শুধু মিছে দুয়ো দেয়।

যোগব্রত

একটা পাইথন
তোমার পিছু নিয়েছিল।

একবারও ভাবলে না
জুনোরা চিরকাল
ল্যাটোনার পিছু পিছু
পাইথন পাঠায়।

বুঝলে না যোগব্রত
কঠিন সময়
অ্যাপোলোর অব্যর্থ তীর
থাকে না সবার তূণে।

নান্দনিক চর্চার নামে

ইনিয়ে বিনিয়ে সাত সতের নাকী সুরে কান্না
জীবনভ'র চলবে নাকি এই সব বুজরুকি
সাত সমুদ্দুর ভাসিয়ে দিয়ে বইয়ে দেবে বন্যা
নান্দনিক চর্চার নামে জীবন নিয়ে এই ইয়ার্কি !
এরই জন্য হ্যাংলামিপনা কৃতাঞ্জলি ক্যাংলা হাতে
রকমারি ফন্দি ফিকির কেবল কোলে ঝোল টানা
ধ্রুপদী মার্কা লেবেল-আঁটা রাংতা-মোড়া মসলাতে
প্রভুভক্ত কেরামতি নিবের ডগায় হুকুম মানা ।
ক্ষতস্থানে খুনসুটি করে সুড়সুড়ি দিয়ে হবে কি ভাই
লোক-ঠকানো ব্যাপার স্যাপার অলৌকিক ছলাকলায়
আখেরে যদি দেখতে পাই বরবাদ মূল বেতনটাই
পেট ভরে কি ভরে মন বেতনছুট মাগ্যিভাতায় ?

যন্ত্রণার উৎস কোথায় জীবনের দ্বন্দ্ব
কোন্ নিশানা ঠিক ঠিকানা কোথায় পোক্ত বনিয়াদ
আত্মকেন্দ্রিক ধান্দাবাজি রেখে এখন বন্ধ
খোঁজ নেবে কি মাটি-ছোঁয়া সেই মানুষের সংবাদ ?
আলগা হাত শক্ত করে পারো যদি ধরো দেখি
লেখক-পাঠক তৈরি হোক মজবুত এক সাঁকো
হুকুমদারির সটান মুখে ঝাড়ু মেরে লাথি হেঁকে পারবে কি ?
নইলে মশাই ন্যাকা ন্যাকা লেখাটেখা শিকেয় তুলে রাখো ।
কি হবে শুধু ঘ্যানর্ ঘ্যানর্ ওই প্যানপ্যানানি লেখা
মিথ্যে কথার কালি-ভরা বকশিস-পাওয়া কলমে
এভাবে কখনো যাবে কি সারানো আদ্যিকালের পুরনো ঘা
সস্তায় হবে কিস্তিমাৎ ক্ষত শুকোবে মলমে ?

গরমিল ঃ ১৯৮০

এইভাবে কি হিসেব মেলে ?
এইতো সেদিন নক্‌সা করে সাত সতের
কত কথাই বলেছিলে ঃ হাতটা তোমার
শক্ত হলে পৌঁছে দেবে সুখের ঘরে
প্রতিপক্ষ নিপাত গেলে সোনার হরিণ এনে দেবে।

সুখ সুখ সুখ কী অপরূপ !
মিসার বাঁধন জেলবন্দী
সেনসরশিপ কাটা-বোনাস বেপরোয়া নির্বীজনে
সুখের শরীর এফোঁড়-ওফোঁড়
আহা কী সুখ ! ভুলতে পারি ?

আবার এলে জোড় হাত করে
রক্তে-ভেজা দস্তানাটা
লুকিয়ে রেখে হাসি মুখে
চিকন হাতে ভেবেছো ঠিক
রাখবে ঢেকে কালো মুঠো !
আর উজবুক যত মানুষগুলো
ভুলে যাবে বুজরুকি সব।

সর্বোপরি

যতই থাক অগুন্তি মানুষ
লক্ষ্মীহারা ভিটেছাড়া
থাক না কেন নকল ফানুস
হাজারো মগজ মরচে পড়া ।

সাকরেদ দল এবং যত
নপুংসক তকমাধারী
নির্জীব জীবন দণ্ডবত
তাদের সেবা কি ভুলতে পারি ?

ঘুড়ি

কতো উঁচুতে আর তুলবেন ঘুড়ি
হুজুর, এবার লাটাই গোটান।

ভুলে গেলেন এই তো সেদিন
বেবাক উল্টে গেল মোরগের ঝুঁটি—
হাওয়া-মোরগ ম্যাজিক জানে কি?
নাকি পাল্টি খায় নিজে নিজে?

সুতো ছাড়া বন্ধ রেখে
আকাশ-ছোঁয়া ঘুড়িটাকে
নাগাল সীমার ভেতর নামান।

যতই ক'ষে মাঞ্জা দিন
মৃদু বাতাস নেই আকাশে
ভোঁ-কাট্টা হবার আগে
দ্রব্যমূল্যের ঘুড়িটাকে
আরো একটু নিচে নামান।

দমকা হাওয়ায় ঘুড়ি ওড়ে না
হুজুর, এবার লাটাই গোটান।

আজ যদি

আজ যদি বেঁচে থাকতে, ধরো আজ,
কি করতে তুমি, রবীন্দ্র ঠাকুর ?

"ইংরেজি শিখে যাঁরা পেয়েছেন বিশিষ্টতা
তাঁদের সঙ্গে মনের মিল হয় না সর্বসাধারণের
দেশের সব চেয়ে বড়ো জাতিভেদ এইখানেই
শ্রেণীতে শ্রেণীতে অস্পৃশ্যতা—
মাতৃভাষা যার বাংলা, তার পক্ষে
ইংরেজি ভাষার মতো বালাই
আর নাই —....
মাতৃভাষাই মাতৃদুগ্ধ —...." ইত্যাদি যাবতীয় কথা
আজ কি বলতে পারতে সব মিথ্যা সব মিথ্যা
ইংরেজি বাঁচাও বলে এসপ্ল্যানেড ইস্টে
কারাবরণ করতে এঁদের সঙ্গে ?

অথবা
যা ছিল ঈপ্সিত তোমার :
মূর্খতার এই অভিশাপে প্রাণহীন বাংলা ভাষার স্রোতে
যারা আনবে সঞ্জীবনী ধারা, সেই ভগীরথ
পৃথিবীর কাছে উপেক্ষিত মাতৃভাষার
লজ্জা করতে দূর
আনন্দে আবেগে স্নেহে কি তাদের
আশীর্বাদ করতে না ঠাকুর ?

আগ্নেয় কুসুম

যেদিকে তাকাই যাকেই দেখি রক্তচক্ষু
নাম উচ্চারণে দাঁত ভেঙে আসে কনজাংটিভাইটিস।

চোখে চোখে যেন পলাশ ফুটে আছে
পলাশ পলাশ আহা আগ্নেয় কুসুম !
এক–দুই–তিন নয় শ'য় শ'য় হাজারে হাজারে
নাছোড়বান্দা ভাইরাস সেঁধিয়ে যাচ্ছে তো
যাচ্ছেই বেপরোয়া চোখের ভিতর।
একটু আগে যে ছিল মোলায়েম
উদাস পেলব মাখা নির্বিকার নীল
মুহূর্তের ছোঁয়ায় সে ফুলে ফুঁসে ক্রুদ্ধ অগ্নিশর্মা।

বেয়াদব ভাইরাস শালা
চোখের ভিতর দিয়ে মগজে ঢোকে না কেন ?
ঘুমপাড়ানি গান শুনেই শুধু আমরা যে সব ধেড়েখোকা
ঝিমোচ্ছি নেশায় বুঁদ সকাল বিকেল সন্ধ্যে
আর খোয়াব দেখছি কবে আমাদের চাঁদমামা
হামা টেনে কার কপালে টি' দিয়ে যাবে !

এতো কিছু দেখে শুনেও ন্যাকাচৈতন
দু'গালে থাপ্পড় খেয়ে হাঁটু ভেঙে মুখ গুঁজে
আজব একুশে আইনের নিষেধ মেনে স্বেচ্ছাবন্দী
বুড়ো আঙুল মুখে ভ'রে জুজুর ভয়ে নপুংসক
জীবন ভ'র জবুথবু উবু হয়ে বসে আছি।

বস্তুতঃ এ সময়   চেতনার স্তরে স্তরে
কোন সংক্রামক ভাইরাসের দ্রুত সংক্রমণ চাই
এই সব উজবুক চৈতন্যে চাই ক্ষোভের আগুন
বেয়াদব ভাইরাসের মতো বেমালুম বেপরোয়া
চোখের ভিতর দিয়ে মগজ বরাবর   বুকে
নেমে আসুক বর্ণচোরা বেওয়ারিশ আগাছার ঝাড়ে
অপুষ্পক বোধের চারায় ফোটাক আগ্নেয় কুসুম।

অন্য আকাশ

খোলা জানালায় চোখ রাখলো সে

ভ্যাপসা উৎকট গন্ধ-ছড়ানো ঘর
যার স্যাঁৎসেঁতে মেঝে চুণ-খসা
লোনা-ধরা দেয়াল   আর একটাই জানালা
যা বন্ধ থাকতো সারাক্ষণ

কী অর্থ হয় খুলে রাখার   সে ভাবতো
কারণ জীবনের অর্থটা নৈরাশ্যের ঘোরে এলোমেলো
ছুটতে ছুটতে কোথাও আটকা পড়েছিল ওই
অন্ধকার চার দেয়ালের মধ্যে   আর নিশ্চল
মৃতদেহের মতো নিশ্ছিদ্র দেয়ালের অস্তিত্ব
সে অনুভব করতো হাঁটু ভেঙে মুখ গুঁজে মেঝের ওপর

জীবনের মান   বেঁচে থাকার মানে ইত্যাকার
জরুরি ভাবনাগুলো প্রশ্বাসে ছড়িয়ে দিতো ধূসর টালির চালে

সে ভাবতো আর ভাবতো

এমনিতেই ইঁট-বের-করা দেয়ালগুলো দাঁত খিঁচিয়ে
তাকিয়ে থাকতো তার দিকে   আর সেই দিকে
তাকিয়ে তাকিয়ে মাঝে মাঝে কোন বিলম্বিত লয়ের
একটানা কান্না সে শুনতে পেতো

তারপর সেই দীর্ঘ একটানা কান্না
খান্‌খান্‌ ছড়িয়ে পড়তো তার চাদ্দিকে
টুকরো টুকরো বিপন্ন ভাবনা সেই সঙ্গে মিলেমিশে

একাকার হয়ে যেতো দম-বন্ধ-করা চাপা আর্তনাদে
দুটি টিকটিকি গোটাকয়েক আরশুলা আর ক'টি
নেংটি ইঁদুর ঘুরে বেড়াতো বেপরোয়া   আর
দেয়ালের কোণে কোণে জালের ভেতর থেকে
উঁকি দিতো কিছু মাকড়সা

এইভাবে ঠিক এইভাবে জালে আবদ্ধ নিস্পন্দ মশা
আর মুখ-থুবড়ে-পড়া তার নিজের সঙ্গে একটা
সহ-অস্তিত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল   অন্ততঃ
তাই তার মনে হতো

হঠাৎ দমকা হাওয়ায় একদিন তার
ঘরের একমাত্র জানালার কপাট ভেঙে গেলো
একটুকরো প্রসন্ন আকাশ উঁকি দিলো কিনা
সে বুঝতে পারলো না   সে ভাবলো
প্রতিটি মুহূর্ত বিপন্ন যার কাছে   তার কাছে
প্রত্যাসন্ন সে আকাশ   কোন্ আকাশ

খোলা জানালায় চোখ রাখলো সে
না   খোলা আকাশ তাকে হাতছানি দেয়নি
শুধু হাওয়া এসে এ ঘরকে নাড়া দিয়ে গেছে
বুড়ো আমগাছটার ডালের ফাঁক দিয়ে তখনো
ঝুলছে ঘেয়ো চাঁদ

কী জানি কি দেখলো সে
কাছের উঁচু উঁচু বাড়িগুলোর দিকে তাকালে স্পষ্টতঃ
সে দেখতে পেতো স্বপ্নলোকের বাসিন্দাদের
জানালা-দিয়ে-দেখা পার্কের একাংশকে অনায়াসে
ভাবতে পারতো স্বর্গের উদ্যান
খেলায় মত্ত কল্‌কল্ উচ্ছল ছেলেমেয়েদের ভিড় দেখে

ভাবতে পারতো দেবশিশুদের মেলা   মাধবীলতায়
ঘেরা গেট পেরিয়ে স্বচ্ছন্দে তার দৃষ্টি পৌঁছে যেতে
পারতো কোণের বাড়িটার সামনে   যেখানে
সন্ধ্যার তরল আবছা আলোয় স্পষ্ট দেখতে পেতো
বেতের চেয়ারে গা-এলিয়ে-বসা ও বাড়ির বৃদ্ধ
এবং বৃদ্ধাকে   দেখতে পেতো মানিপ্ল্যান্ট-ঘেরা
দোতলার ঝুল বারান্দায় দাঁড়িয়ে-থাকা তরুণীটিকে
অথবা আউটহাউসের গা-ঘেঁষে আকাশী রঙের গাড়িটার
মন্থর প্রবেশ আর ফুলবাগান পেরিয়ে দ্বিতীয় ফটক
যেখানে রাস্তায় মিশেছে সেখান দিয়ে কালো রঙের
গাড়িটার দ্রুত প্রস্থান

কিন্তু এসব কিছুই দেখতে পেলো না সে
শুধু একটা কুয়াশার চাদর যা বিছানো ছিল ওর
মনে   যার পুরু আস্তরণ ভেদ করার
সাধ্যি ছিল না তার   কিভাবে সেটা সরে গেল
শুধু সরে গেল তাই নয়   বিচিত্র হাওয়ায়
শেষ পর্যন্ত ছিঁড়ে ফুঁড়ে ফর্দাফাঁই

কী যেন পাওয়ার কথা ছিল   সে ভাবলো
বাতাসে কিসের যেন গন্ধ   কে যেন
চুপি চুপি কী কথা বলে গেল

সে ভাবে   ভাবে আর ভাবে   গোবর জলে
নিকোনো হবে উঠোন   মাড়াই হবে ধান
আবার কেনা হবে মায়ের নাকের নথ
হাট-ফেরতা সওদায় ভরে উঠবে ঘর

কী যেন দেবার কথা ছিল   মনে পড়লো তার

চোখ সরিয়ে নিলো সে   আর তৎক্ষণাৎ
ঝড় উঠলো তার বুকের ভেতর   জমাট-বাঁধা
গ্লানি ফুটলো টগবগিয়ে

তার বুকের ভেতর ঝড়   পাথর-চাপা বুকের
ভেতর উথালপাথাল ঝড়   সেই ঝড়ে
দরজার কপাট ভেঙে হাট   দেয়াল ফেটে চৌচির

ইসটিশান থেকে হাঁটাপথ   হাঁটাপথেই বাড়ি গেল সে

পরদিন সকালে দাওয়ায় বসে গলা বাড়িয়ে
যখন মা বললেন   খোকা কাজ পেলি
পূবের আকাশটার দিকে চোখ রেখে স্থির
সে জবাব দিলো   কাজ খোঁজার কাজে
ঘেন্না ধরে গেছে   মা   এবার
নামবো অন্য কাজে   কাজ নেই যাদের
তাদের নিয়েই এখানে কাজ আমার
সে অনেক কাজ।